আলোচনা -

গল্প- ভাঙাঘরের কাব্য , লেখক – সুলেখা সান্যাল

‘কাব্যের উপেক্ষিতা’র ট্র্যাডিশন বাংলা সমালোচনা প্রবাহে আজো সমানে চলেছে। অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার মতো বিকাশমুখী ব্যক্তিত্ব সেখানে লাঞ্ছনার প্রহার সয়ে চলেছে অবিরাম। আসলে সীতা বা কাদম্বরীদের মতো প্রতিষ্ঠিতদের প্রতি একদৃষ্টে তাকাতে এত ব্যস্ত যে অন্যদের কথা ভাবার ফুরসতই পাওয়া যায় না। ‘মূল স্রোত’, ‘মার্জিনাল স্রোত’ - এইসব অন্ধ শব্দটোপের আলো আঁধারিতে হারিয়ে গিয়েছেন দীপেন্দ্রনাথ, শান্তিরঞ্জন, সুলেখা সান্যালের মতো শক্তিমান কথাকার।

মাত্র চৌত্রিশ বছরের (১৯২৮-৬২) আয়ু সম্বল ছিল সুলেখা সান্যালের। ছিল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংস্রব, দারিদ্র্য, মানসিক যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত বিপর্যয় ও কর্কট রোগের মৃত্যু- আগ্রাসন। পদে পদে বাধা পায় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, তবুও চলতে থাকে রাজনীতির পাশাপাশি লেখালিখি। প্রথম গল্প ‘পঙ্কতিলক’ প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালের ‘অরণি’ পত্রিকায়। কম বেশি ৩১ টি গল্প লেখেন তিনি। যার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ‘পরিচয়’, ‘চতুষ্কোণ’, ‘নতুন পত্রিকা’, ‘স্বাধীনতা’ এমন বহু সাময়িকীর পাতায়। বামঘরানার বাইরেও বিস্তার পেয়েছে তাঁর সৃজন জগৎ। কিন্তু এত বঞ্চনা ও প্রতারণার পাহাড় পেরিয়ে , তীক্ষ্ণতম শারীরিক কষ্ট বহন করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও, উত্তরকালের মানুষ তাঁকে তেমন করে মনে রাখেনি।

লেখকের আত্মিক যন্ত্রণার হুবুহু বিকাশ সম্ভব নয় কখনওই। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের খণ্ড বিখণ্ডের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রে। সুলেখা সান্যালের রচনাতেও সমগ্র সত্তার ছিন্নাংশেরই প্রকাশ ঘটেছে। জলছবির মতো ভেসে উঠেছে ভাঙা ভাঙা টুকরো টাকরা সত্তার নিঃশব্দ উপস্থিতি। তাঁর ‘ভাঙাঘরের কাব্য’ এমনই এক গল্প।

গল্পের নাম এবং গল্পের শুরু দুটোতেই ‘ভাঙা’ শব্দের ব্যবহার। ভাঙন ধরা বেসুরো কাব্যি যেন। ‘উলটে যাওয়া নৌকা’ যেন তারই এক নষ্ট চিত্র। কড়া নাড়ার আওয়াজটাও ‘খটখট’ করে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ধ্বনিবিন্যাসেও সেই বে-সুর কাঠিন্য। ‘খটখট’, ‘খিল’-এ নির্মিত কর্কশ অনুপ্রাস।

সুমন্তর প্রতি বাসন্তীর প্রতিক্রিয়াতেও সে-ই নির্মম কর্কশতা। ‘ দাঁতে দাঁত চেপে গা পোড়ানো কথা’, না খাওয়া, ‘ছেলেমেয়েগুলোকে পিটবে দুমদাম’ – এগুলো নিত্য বর্তমান ক্রিয়ায় ব্যবহৃত। অর্থাৎ ছোট ঘরটায় অতিথি এলে বাসন্তী এমনই প্রতিক্রিয়া করে থাকে । এই প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতাতেও জঙ ধরে গেছে, মরচে পড়ে গেছে।

বাসন্তীর শব্দ নির্বাচনেও অদ্ভুত ঋণাত্মক কাব্যিকতা। ‘ঘরের গরমে, আগুনের গরমে’ সে জামা রাখতে পারে না গায়ে, তার উপর সামনে বসে থাকে ‘ধুমসো পুরুষ মানুষ’।

একরত্তি এক বারান্দা। সেটাও ব্যবহৃত রান্নার কয়লা আর কাঠে - দাহ্য পদার্থে। অর্থাৎ অবসর যাপনের জায়গায় বিস্ফোরণের মালমশলা(মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘স্টোভ’ গল্পের কথা)। মন্মথের চেহারাতেও আবার সেই ঝড়ের প্রসঙ্গ – ‘কেমন উড়ে পড়া কাকের মত রুক্ষ শীর্ণ চেহারা’। চেহারা ভালো অবশ্য সুমন্তরও নেই। মন্মথদার জন্য চা করার অনুরোধে (অপরাধীর মতো) বাসন্তী ‘দুম’ করে কড়া নামায় ও চায়ের জল বসায়।

মনুদা কথায় কথায় একই প্রগল্‌ভতায় অরুনার মৃত্যু ও ছাত্রী জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে এবং পুত্রলাভের কথা জানায়। জ্যোতি ও মনুদার আর্থিক সংকট ও জোড়াতাপ্পি মারা সংসারের একটা আবছা ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। জ্যোতি –সুমন্তর আন্তরিক সম্পর্কের চিত্রও চকিতে উঠে আসে। প্যারানয়েড বাসন্তীর গোপনে কান পাতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পরে সুমন্ত। ঘর যেখানে ভঙ্গুর, সেখানে এমনটাই তো স্বাভাবিক। 'আশ্চর্য সুন্দর সুমন্তে'র প্রতি প্রেম প্রচ্ছন্ন, সন্দেহ আর আগ্রাসী চৈতন্যই প্রকট। আসলে 'বাজে' কিছু একটা, সুরে হোক অথবা বেসুরে।

ঘুপচি ভাঙা ঘরের চোরাপথে উঁকি দেয় বাইরের আলো। শ্বাসকষ্ট থেকে বাঁচতেই মানুষ একটু বাইরে ছোটে। সুমন্তও এক শনিবারে 'উলটে যাওয়া নৌকোর মতো বাসায় ফিরতে' না চেয়ে মন ভালো করার জন্য ছুটে যায় জ্যোতির কাছে। প্রাণখোলা বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নেয় দুজনেই। মন খুলে বিনিময় হয় দুই ভাঙা ঘরের সুরেলা কাব্যি। দুজনের শূন্যতা যেন হু হু করে গেয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মনুদাও যেন পিতৃতান্ত্রিকতার আভাস বশেই (সুমন্তও তার বাইরে নয়) বাধ্য ঘরোয়া মেয়ে খুঁজে বেড়ায়। যাকে শেখাবে, পড়াবে আবার যার উপর নির্ভর করবে। বাসন্তীর কাছে গিয়ে ঠিক সেই আস্বাদটাই পায়। অদ্‌ভুতভাবে অ-সঙ্গতিগুলো যেন যথার্থ সঙ্গতে সুরেলা হয়ে ওঠে। যদিও সবই সম্ভবত আপাত ও আপতিক।

মুখরা বাসন্তীর মধুর পরিবর্তনে বিস্মিত হয় সুমন্ত। এ মাধুর্য তার কাঙ্ক্ষিত, কিন্‌তু তার কর্তৃত্বে না হয়ে অন্যের কারণে হলে সেটা কিছুতেই আত্তীকরণ করতে পারে না। ওদিকে মনুদাও বারবার ঠারেঠোরে তার inferiority complex-এর কথা জানায় জ্যোতিকে। জ্যোতি এই অনস্বীকার্য সত্যিটা জানে, তবুও তার কান্না পায়। বাস্তবিকই সম্পর্কের বিচিত্র ঘরবাড়ি, ঠিকানা পাওয়া কঠিন।

সুমন্ত আর জ্যোতি দুজনেই তাদের দাম্পত্য সঙ্গীর কাছে ভুল নির্বাচনের কথা স্বীকার করে। কিন্‌তু তাতেও স্বস্তি পায় না। দুজনে এক সাথে থাকলে দুজনেরই মনে হয় - যেন কোথাও কোনও অবহেলা নেই – সব যেন মহুয়ার মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন। হয়তো সাময়িক বলেই এতটা তৃপ্তি। নিত্য নৈমিত্তিকের তেলচিটে দাগ সেখানে পড়েনি।

বীণা সিনেমা হলে দেখা হয়ে যায় চার জনের। দাম্পত্যের অপ্রচল ভূমিকায় মুখোমুখি হয় তারা। অস্বস্তির ফাঁকফোকর গুলো বোজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাসন্তী। ঘরে ডেকে এনে খাওয়ায় সবাইকে। আসলে এ-ও একটা মানস প্রতিরক্ষা। কিন্‌তু কতক্ষণ! বিপন্নতা আর অসুখ গুলো আবার মুখোমুখি হয়। ঝগড়া করে। নীরব হয়। অথচ জ্যোতি কিংবা সুমন্ত কেউই ঠিক এমনটা চায়নি। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের ভাঙা ঘরে থেকেই ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে চেয়েছিল। ওটুকু মুক্তিই হয়তো কাঙ্ক্ষিত। ভাঙা ঘরের কাব্যিকতা ওখানেই।